ঠুমরী ঃ—ঠুং শব্দ থেকে ঠুমরী আসেনি। ঠুনকো অর্থে ক্ষণভঙ্গুর সেই হিসাবে আমরা ঠুনকো গীত, বা ছোট ছোট গীত এই মনে করতে পারি। নৃত্যের একপ্রকার বিশেষ সুষ্ঠু পদক্ষেপকে হিন্দীতে ঠুমক বলা হয়। এই

ঠুমক্ শব্দ থেকেই ঠুমরী নামটি এসেছে। নাচিয়েদের ঘর থেকেই ঠুমরী চালের গানের জন্ম এবং সেই কারণে কালকা-বিন্দাদিনের ঘর থেকে ঠুমরী প্রকাশ পেয়েছে বলা হয়। আমরা কালকাবিন্দার নামে গাঁথা কিছু ঠুমরী গানের রচনা দেখতে পাই। যাঁরা ঠুমরীর জন্ম নাচিয়ের ঘর থেকে বলেন তাঁদের মতকে আমরা অমান্য করতে পারি না, তবে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। জন্মের কথায় পরে আসছি, আসলে ঠুমরী হল সোনার কাঠি, ওর পরশে হাজার দুয়ার যায় খুলে। তানের টানে, মীড়ের মোহে, নানা রং মেশান সুরের জালে ও রচে সুর-স্বর্গের ইন্দ্রজাল। প্রাণের মাঝে জ্বালায় রং মশালের রঙ্গীন আগুন। বিচিত্রতায় ভরা, যেমনি মধুর তেমনি লাবণ্যময়ী। ও হল সুন্দরী তিলোত্তমা, তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করে ওকে ভরিয়ে তোলা হয়। ঠুমরী হল ধ্রুপদের দৌহিত্রী, তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে জড়িত থাকলেও ওর নবীন বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব। ওর পিতৃদেব খেয়াল রাগরূপকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি, সে স্বাধীনতা চেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় নি, ওর বোন টপ্পাও এ ব্যাপারে হার মেনেছে। কিন্তু ঠুংরী তার সুরসৃষ্টির চাতুরীতে পেয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, রাগমুক্তি। ও অসবর্ণা, তাই রাগের জাত মানে না, যখন যেমন খুশী মিশিয়ে চলে নানা রাগের সৌন্দর্য্যকে। ও জড়োয়ার নেকলেশ, বসিয়ে দেয় মুক্তার পাশে চুণী ও পান্না, আবার হীরার দ্যুতির ঝলকও দেখা যায় ওর গাঁথুনীতে। ও পাঁচফুলের সাজী, সেখানে রয়েছে রজনীগন্ধার পাশে গোলাপ, আবার তারি পাশে দেখা যায় স্বর্ণচম্পা, মাঝে মাঝে ছোট নানা বাহারী পাতা, এক অপূর্ব মিশ্রণ, অফুরন্ত উচ্ছলতা। প্রাণশক্তিতে মহীয়সী এই ঠুমরী। নিত্য নব নব রূপে ও জয় করে চলেছে শ্রোতার হৃদয়। ওর সম্পূর্ণতা নেই, ওর সম্পদ বেড়েই চলেছে নানা জনের নানা দানে।

শোনা যায় ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকেই ঠুমরী গান চলে আসছে, তবে সেকালের কোন ঠুমরী গায়কের নাম ধাম আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নি। ইংরাজ রাজত্বের সময় লর্ড ডালহাউসী ১৮৫৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যখন মেটেব্রুজে নির্বাসিত করেন তখন থেকেই ঠুমরীর চলন প্রাধান্য লাভ করে। নবাব ওয়াজিদ আলিশার সভায় একশো-দশ জন সভা-গায়ক গায়িকা ছিলেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই ঠুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই ছিলেন না, নাট্যগীতি বা কাব্যগীতির রচনায়ও তিনি উৎসাহী ছিলেন, অনেক গীতিকাব্য রচনাকে তিনি ঠুমরী নামে প্রচার করেছিলেন। তাঁর

এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলি কদর তাঁকে এই রচনার বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, "কদরপিয়া" এই ছদ্ম নামে তিনি ঠুমরীর জন্য অজস্র গান রচনা করেছিলেন। এই ঠুমরীতে ব্রজভাষা বা পূর্বীভাষা ব্যবহার করা হত। এতে দুই থেকে ছটা আটটা পর্য্যন্ত তুক চালু ছিল। বিস্তারে কিছু খেয়ালের ভঙ্গীও থাকতো। এই সময়ে "লখনৌ ঠুমরী তাল" বলে একটি তালও চলেছিল যা ঠুমরী গানের সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া তিনতাল, একতাল ও পাঞ্জাবী ঠেকাতে ঠুমরী গাওয়া হত। ঐ সময়ে আরও দু এক জনের ঠুমরী গান রচনার কথা শোনা যায়। তাঁরা হলেন ইয়াশপিয়া, চাঁদশা প্রভৃতি। এঁদের অনেক গান লিপিবদ্ধ আছে, তবে এঁরা কোথা থেকে ঠুমরী গান শিখেছিলেন তার ঠিক ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। ঠুমরীর জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ, দিল্লীর আশে-পাশে বা অন্য কোথাও হতে পারে, সেটি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।

লক্ষ্ণৌ ঠুমরী থেকে জন্ম নিল বেনারসী ঠুমরী, যাকে অনেকে পূরবী ঠুমরী বলেন। শোনা যায় আলীবক্স খাঁ, মুন্নে খাঁ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্যাল গায়কেরা ঠুমরী অপূর্ব গাইতে পারতেন, তবে তাঁরা কোন সঙ্গীতাসরে তা পেশ করতেন না। কলকাতায় যাঁরা ঠুমরীকে চালু করেন, তাঁদের মধ্যে ভাইয়া-সাব গণপৎরাও এবং মৈজুদ্দিনের নাম সকলেই করেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব ঠুমরীতে উস্তাদ ছিলেন। তাছাড়া মোতী বাঈ, অচ্ছন বাঈ, জর্দন বাঈ, গহর বাঈ, মালকাজান, প্রভৃতি বাঈদের দানও কম নয়। এইসব বাঈরা অনেকেই মইজুদ্দিনের কাছ থেকে তালিম পেয়ে ছিলেন। আর একজন বাঙ্গালী গুণী স্বর্গীয় উস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর দানও অস্বীকার করা যায় না। মৈজুদ্দিন ঘরাণার এবং ভাইয়া সাহেবের ঠুমরীর তিনি একজন ধারক ও বাহক ছিলেন। অনেক সাগীর্দ্দকেই তিনি যত্ন করে ঠুমরী শিখিয়ে গেছেন। ওয়াজীদ আলির ঠুমরী যখন চলছে, তখন কবাল ঘরের সাদেক আলি লচাও ঠুমরীর প্রচলন করেন। অনেকের ধারণা যে বর্তমানের এই ঠুমরী সাদেক আলির ঠুমরীর অনুসরণ। বর্তমানে উস্তাদ গোলাম আলি প্রভৃতির ঠুমরীকে পাঞ্জাবী ঠুমরী নাম দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবী "খড্ডা" তাতে মেশান আছে। ঠুমরী পরিবর্তনশীল, সবরকমের ষ্টাইল, সবরকমের সুন্দরতার মিশ্রণেই ওর বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রতাই ওর প্রাণশক্তি। আজকাল হোলীর গান, দাদরার গান, এমন কি কাজরী, চৈতী প্রভৃতি জাতীয় গানকেও অনেকে ঠুমরী বলেন, সেটা ঠিক নয়।

আধুনিক ঠুমরীতে দুটি তুক থাকে, কখনও কখনও তিন চারটে তুকও দেখা যায়। কিছু লচাও ভাব থাকে স্থায়ীর শেষে লগ্‌গীর ব্যবহার হয়, এবং লড়ীর মত তান দিয়ে বা মুখে এসে শেষ করা হয়। ঠুমরী সাধারণতঃ পাঞ্জাবী তালে, আটমাত্রা এবং সাত মাত্রার যৎতালে, বিলম্বিত অথবা মধ্য লয়ের তিন তালে কিম্বা ছেপকা অথবা আদ্ধায় গাওয়া হয়। দাদরা তালের ঠুমরীকে দাদরা বলা হয়, অনেকে এটিকে ভিন্ন এক জাতের ঠুমরী বলেন। কচিৎ ঠুমরী অন্য দু একটি তালেও শোনা যায়। (দাদ্‌রা দ্রষ্টব্য)